# HISTORY - HONS. SEM - II.

## মৌর্য যুগের গুরুত্ব -
## মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

Scanned with CamScanner

**রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ**

ব্রাহ্মণদের আইনগ্রন্থগুলিতে বারবার বলা হয়েছিল যে ধর্মশাস্ত্রের উল্লিখিত আইন ও দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজা রাজ্যশাসন করবেন। কৌটিল্য রাজাকে অভিহিত করেছিলেন "ধর্মপ্রবর্তক" (dharmopravartok) নামে। রাজাদেশ যে অন্য সকল আদেশের চেয়ে বড়, শিলালিপিতে অশোক সেকথা বারবার লিখে গেছেন। ধর্মের সারকথা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অশোক বহু কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।

মগধের রাজারা সামরিক বিজয়ের যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন রাজার সার্বভৌমত্ব তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। অঙ্গ, বৈশালী, কাশী, কোশল, অবন্তী প্রভৃতি রাজ্য একে একে মগধসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। এইসব অঞ্চলের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ তাই স্বাভাবিকভাবেই জনজীবনের সব বিষয়ের উপর দমনমূলক নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। সর্বত্র কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করার মত ক্ষমতা ও শক্তি মগধের ছিল।

জীবনের সব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রকে একটি বিশাল আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করতে হয়েছিল। মৌর্যযুগের মত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্য কোন যুগে এত বেশি সংখ্যক রাজকর্মচারী নিযুক্ত হবার কথা জানা যায় নি।

শাসনব্যবস্থাকে সাহায্য করত একটি সুবিন্যস্ত গুপ্তচরব্যবস্থা। বিভিন্ন ধরনের গুপ্তচররা বিদেশী শত্রুদের সম্পর্কে গোপন তথ্য সরবরাহ করতেন এবং বহু রাজকর্মচারীর গতিবিধির উপর নজর রাখতেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীদের বলা হত 'তীর্থ' (trithas)। খুব সম্ভব অধিকাংশ কর্মচারী বেতন পেতেন মুদ্রায়। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ প্রভৃতি ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁরা 48,000 পান (pana) বেতন পেতেন ( পান হল একটি রৌপ্যমুদ্রা, একটি তোলার

Scanned with CamScanner

তিন চতুর্থাংশ মূল্য ছিল একটি পানের ) বলে জানা গেছে। কিন্তু নিচুপদের যে সব কর্মচারী কাজ করতেন তাঁরা পেতেন সবমিলিয়ে মাত্র 60 পান। কেউ কেউ আবার মাত্র 10 অথবা 20 পান পেতেন বলেও জানা গেছে। সুতরাং উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান ছিল সেটা পরিষ্কার।

**অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ**

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনা করার জন্য 27 জন অধ্যক্ষ (adhyakshas) নিয়োগ করা হয়েছিল। কৃষি, ব্যবসাবাণিজ্য, ওজন ও বাটখারা, তাঁত, খনি সব কিছুই ছিল এই অধ্যক্ষদের নিয়ন্ত্রণে। কৃষিজীবীদের সুবিধার্থে রাষ্ট্র অনেক সময় সেচের ব্যবস্থা করতেন। মেগাস্থেনিস বলেছেন যে, মিশরের মত মৌর্যযুগেও এমন এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন যাঁরা জমি পরিমাপ করতেন এবং সেচের জল যে বড় খালগুলির মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট নালায় গিয়ে পড়ত সেগুলির তত্ত্বাবধান করতেন।

অর্থশাস্ত্রকে যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে মৌর্যযুগে একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্হার উদ্ভব হয়েছিল তা স্বীকার করতেই হয়। সেই ব্যবস্হাটি হল কৃষিকার্যে ক্রীতদাস নিয়োগ। মেগাস্থেনিস বলেছেন যে ভারতবর্ষে কোন ক্রীতদাস তাঁর চোখে পড়েনি। তবে বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষে গৃহের কাজকর্মে যে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মৌর্যযুগেই প্রথম ব্যাপক হারে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা শুরু হয়েছিল। রাষ্ট্রের নিজস্ব খামারগুলিতে অসংখ্য ক্রীতদাস ও ভাড়াটে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করা হত বলে অনুমান করা হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক যে দেড়লক্ষ মানুষকে বন্দী করে এনেছিলেন সম্ভবত তাদের কৃষিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ক্রীতদাস নির্ভর সমাজ ছিল না। প্রাচীন গ্রীস বা রোমে ক্রীতদাসদের যে সব কাজ করতে হত ভারতবর্ষে সেগুলি করতেন শূদ্ররা। উচ্চ তিনটি বর্ণ শূদ্রদের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি বলে মনে করতেন। ক্রীতদাস, কারিগর, ক্ষেতমজুর, গৃহভৃত্য প্রভৃতি কাজে শূদ্রদের ব্যবহার করা হত।

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ যে সাম্রাজ্যের একটি বিশাল অংশে জুড়ে অনুভূত হত তার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম কারণটি অবশ্যই রাজধানী পাটলি-

Scanned with CamScanner

পুত্রের সুবিধাজনক অবস্থিতি। পাটলিপুত্র থেকে রাজকর্মচারীরা চারিদিকে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারতেন। তাছাড়া প্রধান সড়কটি পাটলিপুত্র থেকে বৈশালী ও চম্পারণের মধ্যে দিয়ে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিমালয়ের পাদদেশেও একটি সড়ক ছিল বলে জানা যায়। বৈশালী থেকে চম্পারণ, কপিলাবস্তু, কলসী ( দেরাদুন জেলার অন্তর্গত ) হাজারা হয়ে সড়কটি শেষ হয়েছিল পেশওয়ারে। মেগাস্থেনিস বলেছেন উত্তর পশ্চিম ভারত ও পাটনার মধ্যেও একটি সংযোগকারী সড়ক নির্মিত হয়েছিল। পাটনা ও সাসারাম এবং সাসারাম ও মীর্জাপুরের মধ্যেও সড়ক নির্মিত হয়েছিল। রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে কলিঙ্গে পৌঁছান যেত পূর্ব মধ্যপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে। আর কলিঙ্গ থেকে অন্ধ্র এবং কর্নাটকেও যাওয়া যেত। অতএব পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল সুবিধেজনক। পরিবহণ কার্যে অশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে অনুমান করা হয়।

উপরন্তু মৌর্য শাসকদের একটি বিশাল জনসংখ্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। যে যাই বলুক তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে 650,000 এর বেশি সৈন্য ছিল না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সমগ্র জন সমষ্টির দশ শতাংশ নিয়োজিত হয়েছিল সেনাবাহিনীতে তাহলে জনসংখ্যা কিছুতেই 70 লক্ষের বেশি ছিল না। অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে রাজার আজ্ঞালেখ বা পরোয়ানা দেশের সর্বত্র প্রচারিত করা হত অনায়াসেই। ব্যতিক্রম ছিল কেবলমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি। তবে মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলের বাইরে কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল বলে মনে হয় না।

মৌর্যযুগের রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছিল বলা যেতে পারে। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র থেকে জানতে পারি যে কৃষক, কারিগর ওব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কর নেওয়া হত। কোন সন্দেহ নেই, করের পরিমাণ নির্ধারণ, করসংগ্রহ ও সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সক্ষম প্রশাসন যন্ত্রের। সংরক্ষণের চেয়ে মৌর্যরাজারা করের পরিমাণ নির্ধারণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। 'সমাহাত' ( Samaharta ) নামক একশ্রেণীর রাজকর্মচারীর দায়িত্ব ছিল করের পরিমাণ নির্ধারণ করা। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মুখ্য রক্ষকের নাম ছিল সন্নিধাতা' (Sannidhata)। 'সমাহাত' এবং 'সন্নিধাতা' রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি করলে প্রথম জনের ক্ষতিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া

Scanned with CamScanner

হত। বস্তুত রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সক্ষম প্রশাসন যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল সর্বপ্রথম এই মৌর্য যুগেই। অর্থশাস্ত্রে করের যে বিশাল তালিকা আছে তার সব কয়টি যদি আদায় করা হয়ে থাকে তাহলে মানুষের হাতে কর দেওয়ার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না বললে ভুল হবে না।

গ্রামাঞ্চলেও যে খাদ্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তা থেকে মনে হয় কর আদায় করা হত দ্রব্যে। এই ভাণ্ডারগুলিতে মজুত খাদ্য দ্রব্য দুর্ভিক্ষ, খরা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় গ্রামবাসীদের সাহায্যে আসত।

যেসব রৌপ্য মুদ্রায় ময়ূর, পর্বত, অর্ধচন্দ্র ইত্যাদির প্রতিমূর্তি খোদাই করা থাকত সেগুলি সম্ভবত ছিল রাজার মুদ্রা। এই ধরনের অসংখ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। কর সংগ্রহ এবং কর্মচারীদের বেতন দিতে এই মুদ্রাগুলি ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়। তাছাড়া একই ধরনের মুদ্রা সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাণিজ্যিক লেনদেনের পথও সুগম করেছিল।

শিল্প ও স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রেও মৌর্যদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মেগাস্থেনিস বলেছেন যে পাটলিপুত্রের মৌর্য রাজপ্রাসাদ ইরানের রাজার রাজপ্রাসাদের মতই অতি উৎকৃষ্ট ছিল। আধুনিক পাটনার অনতিদূরে কুমরাহতে 80টি স্তম্ভযুক্ত হল ঘরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মেগাস্থেনিসের বর্ণনার সঙ্গে না মিললেও মৌর্যযুগের কারিগরেরা স্তম্ভ পালিশ করার কাজে যে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এগুলি তার জ্বলন্ত প্রমাণ সন্দেহ নেই। এই স্তম্ভগুলি উত্তর ভারতের কালো, মসৃণ তৈজস পত্রের মতই চকচকে। খাদ থেকে এই বিশাল বিশাল পাথরের চাঁইকে বহন করে আনা এবং ঘষে ঘষে তাদের মসৃণ করার জন্য যে অধ্যবসায় ও শিল্প নৈপুণ্যের প্রয়োজন ছিল তা অনস্বীকার্য। প্রতিটি স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল একটি বালুশিলা থেকে। স্তম্ভগুলির মাথায় শোভা পেত সিংহ বা বৃষের প্রতিকৃতি। সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এই স্তম্ভগুলি নির্মিত হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় স্তম্ভ মসৃণ করার কারিগরি কৌশল এবং পরিবহণের সুবিধা ছিল সুপরিব্যাপ্ত, মৌর্য কারিগররা সন্ন্যাসীদের বাসোপযোগী গুহা নির্মাণ করতেন পাথর কেটে। গয়ার 30 কিলোমিটার দূরে বারাবার গুহা প্রাচীনতম দৃষ্টান্তগুলির

Scanned with CamScanner

একটি। পরবর্তীকালে গুহা নির্মাণ স্থাপত্য ক্রমশ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

**সংস্কৃতির প্রসার**

একদিকে মৌর্যরাজারা গড়ে তুলেছিলেন একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যেটি সাম্রাজ্যের প্রধান অংশে কার্যকর ছিল। অন্যদিকে তাঁদের সাম্রাজ্য বিজয়, ব্যবসা বাণিজ্য ও ধর্মীয় কার্যকলাপের পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল। অনুমান করা হয় যে প্রশাসক, ব্যবসায়ী, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকেরা যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন তার ফলে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতি সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলেও প্রসার লাভ করেছিল। গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের এই নতুন সংস্কৃতি ছিল লৌহ নির্ভর। খোদাই করা মুদ্রার ব্যবহার, শিল্প মণ্ডিত তৈজস-পত্রের ব্যবহার বন্ধ করা, পোড়া ইটের ব্যবহার এবং সর্বোপরি উত্তর-পূর্ব ভারতে নগরের উত্থান ছিল এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। গ্রীক ঐতিহাসিক অ্যারিয়াস বলেছেন যে এই যুগে নগরের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে তার তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব মৌর্য যুগে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলেও সংস্কৃতির যে দ্রুত উন্নতি ঘটেছিল সেটা পরিষ্কার। দক্ষিণ বিহারের আকরিক লোহা আয়ত্তের মধ্যে ছিল বলে মানুষ ক্রমশ ব্যাপক হারে লৌহ সরঞ্জাম ব্যবহার আরম্ভ করে। খাপে ভরা কুঠার, কাস্তে এবং লাঙ্গলের ফলার ব্যাপক ব্যবহার সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল এই যুগেই। অস্ত্রশস্ত্রের উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল মৌর্য রাষ্ট্রের। কিন্তু তা হলেও অন্যান্য লৌহ সরঞ্জামের ব্যবহার কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এগুলির নির্মাণ পদ্ধতি ও ব্যবহার গাঙ্গেয় অব-বাহিকা অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যের দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। মৌর্য যুগে পোড়া ইটের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় উত্তর-পূর্ব ভারতে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে মৌর্য যুগের পোড়া ইটের তৈরি দালানের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাড়ি নির্মিত হত ইট অথবা কাঠ দিয়ে। প্রাচীন কালে ঘন-অরণ্যের উপস্থিতি কাঠের সরবরাহ সুলভ করে তুলেছিল। মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রে কাঠের তৈরি বাড়ির উল্লেখ করেছেন মেগাস্থেনিস। খননকার্যের কালে জানা গেছে যে কাঠের বড় বড় খুঁটি পুঁতে বন্যা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করা হত। পোড়া

Scanned with CamScanner

ইটের ব্যবহার সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছিল। আর্দ্র আবহাওয়ায় এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য শুষ্ক অঞ্চলের মত এই অঞ্চলে স্থায়ী মাটির কাঠাম নির্মাণ সম্ভবপর ছিল না। অতএব পোড়া ইটের ব্যবহারের প্রসার লাভ ঘটা ছিল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। এর ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ক্রমশ অসংখ্য নগরী গড়ে ওঠে। একই ভাবে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের কুয়োর ব্যবহার ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছিল। গৃহের কাজকর্মে কুয়ো অত্যন্ত উপযোগী ছিল বলে নদীর তীরে বাসস্থান নির্মাণের আর প্রয়োজন রইল না।

উত্তরবঙ্গ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র এবং কর্নাটকের উপর মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতির তেমন কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নি। দিনাজপুর জেলার বানগড়ে উত্তর ভারতের কাল মসৃণ তৈজসপত্রের যুগের সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে। চব্বিশ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড়েও এই যুগের জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে ওড়িশার শিশুপালগড়ের উপনিবেশের উপর গাঙ্গেয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। সম্ভবত এই উপনিবেশ-গুলি মৌর্য আমলে গড়ে উঠেছিল এবং এখানকার অধিবাসীরা লোহার জিনিসপত্র, খোদাই করা মুদ্রা ব্যবহার করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। শিশুপালগড় ধৌলির কাছে অবস্থিত। এই অঞ্চলে অশোকের কয়েকটি শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে মনে হয় মগধের সঙ্গে সংযোগের ফলেই এই অঞ্চলে সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। চতুর্থ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নন্দদের কলিঙ্গ অভিযানের সময় থেকে এই সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল বলে অনুমান। তবে তৃতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কলিঙ্গ বিজয়ের পর এই সংযোগ আরও গভীর হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অহিংসার নীতি গ্রহণ করে অশোক ওড়িশায় সম্ভবত কয়েকটি উপনিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এঁরা মগধ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অন্ধ্র ও কর্ণাটকের কোন কোন অঞ্চলে মৌর্য যুগের লৌহ নির্মিত অস্ত্র ও সরঞ্জাম পাওয়া গেলেও এই অঞ্চলে লোহার ব্যবহার বয়ে আনার কৃতিত্ব মৌর্যদের নয়। ওই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে তৃতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের অশোকের শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মৌর্য যুগের কয়েকটি শিলালিপি অমরাবতীতে এবং

Scanned with CamScanner

অশোকের কয়েকটি শিলালিপি অন্ধ্রের এর্‌রাগুড়ি ও কর্ণাটকের কয়েকটি স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব পূর্ব উপকূলের সংস্কৃতি মৌর্য সংযোগের ফলে নিম্ন দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল মনে হয়।

মৌর্য সংযোগের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়াও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অনুমান। মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে খ্রীষ্ট-পূর্ব 200 অব্দ বা তারও পূর্বেকার ইস্পাত সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। ইস্পাতের প্রসার কলিঙ্গে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য সম্ভব করেছিল। তাছাড়া এই অঞ্চলে চেতি রাজ্যের উদ্ভবও হয়েছিল এই কারণেই। কোন কোন ক্ষেত্রে সাতবাহন সাম্রাজ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে মৌর্য সাম্রাজ্যেরই প্রতিচ্ছবি। সাতবাহন রাজারা মৌর্যদের শাসনব্যবস্থার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন। এবং অশোকের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রধান অংশে বৌদ্ধ ধর্ম যেরকম বিস্তার লাভ করেছিল, সাতবাহন রাজাদের আমলে দাক্ষিণাত্যেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল একই ভাবে।

বাংলাদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্র, ও কর্ণাটকের কয়েকটি অঞ্চলে 300 খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরবর্তী সময়ের শিলালিপি ও খোদাই করা মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে মনে হয় মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতি মৌর্য শাসকেরা সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কৌটিল্যের নির্দেশের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কৌটিল্য উপদেশ দিয়েছিলেন যে কৃষকদের সাহায্য ও জনবহুল অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা শূদ্রদের সাহায্য নিয়ে নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলা উচিত। অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার জন্য কৃষকদের কর দান থেকে অব্যাহতিই শুধু দেওয়া হত না, গরু, বীজ ও অর্থ দিয়েও তাঁদের সাহায্য করা হত। এই খরচ একদিন সুদে-আসলে উঠে আসবে এই ভরসায় রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করেছিল। যে সব অঞ্চলের মানুষ লাঙ্গলের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত ছিল না সেখানে এই ধরনের উপনিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই নীতির ফলে বৃহৎ এলাকায় কৃষিকার্য শুরু হয়েছিল এবং জনবসতি গড়ে উঠেছিল।

মধ্য ভারতে, গাঙ্গেয় উপত্যকার সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে মৌর্য নগরগুলির কী ভূমিকা ছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এটা পরিষ্কার যে উপজাতি শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অশোক ঘনিষ্ঠ

Scanned with CamScanner

যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। ধর্মমহামাত্রদের সঙ্গে সংযোগের ফলে তাঁরা সম্ভবত গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের উন্নত সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই দিক থেকে অশোক যে একটি সুচিন্তিত সংস্কৃতিকরণের নীতি অনুসরণ করেছিলেন সেটা সহজেই বোঝা যায়। অশোক বলেছিলেন যে ধর্মের প্রসারের ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষ দেবতাদের সঙ্গে মিশে যেতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ অশোক চেয়েছিলেন যে উপজাতি শ্রেণীর মানুষ ও অন্য সকলে স্থায়ী, কৃষিসমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠুক এবং অভিভাবক, রাজা, ধর্ম-প্রচারক, পুরোহিত ও রাজকর্মচারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোক। অশোকের নীতি সফল হয়েছিল। অশোক দাবি করেছিলেন যে শিকারী ও মৎস্য-জীবীরা প্রাণীহত্যার পথ ত্যাগ করে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা কৃষিজীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

## মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

মৌর্য সাম্রাজ্য ক্ষমতায় শীর্ষে আরোহণ করেছিল কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে। কিন্তু 232 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে অশোকের প্রস্থানের পর এই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরতে শুরু করে। কয়েকটি কারণ এই পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

## ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়া

অশোকের নীতি ব্রাহ্মণদের মনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। কোন সন্দেহ নেই যে অশোক সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করতে ও ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রাণী হত্যা ও মহিলাদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণদের আয়ে টান পড়েছিল। বলিদান প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণদের আয় যথেষ্ট কমে গিয়েছিল কারণ এই ধরনের আচার অনুষ্ঠানেই তাঁরা দক্ষিণা ও বিভিন্ন উপঢৌকন পেতেন। তাই অশোক সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করলেও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁর প্রতি রুষ্ট ছিলেন। তাঁরা এমন একটি রাজ-নীতি চেয়েছিলেন যা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবে না। মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে

Scanned with CamScanner

নতুন রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে কয়েকটির শাসক ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজারা (এঁরা মধ্যপ্রদেশে শাসন করতেন) ছিলেন ব্রাহ্মণ। একই ভাবে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন সাম্রাজ্যের শাসকেরাও নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ হিসাবে। এই সব ব্রাহ্মণ বংশে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এগুলি অশোক উপেক্ষা করেছিলেন।

**অর্থনৈতিক সংকট**

একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের ভরণপোষণ মৌর্য-সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট ডেকে এনেছিল। আমরা যতদূর জানি প্রাচীন ভারতে মৌর্যরাই সর্ববৃহৎ সামরিক বাহিনী তৈরি করেছিলেন। তাঁদের রাজকর্মচারীদের সংখ্যাও ছিল সর্বাধিক। জনগণের উপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করেও এই বিশাল উপরিকাঠামোর ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। অশোকের দানধ্যানের নীতি রাজকোষাগার শূন্য করে তুলেছিল। এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে শেষদিকে মৌর্যরাজারা সোনার মূর্তি গালিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

**অত্যাচারী শাসন**

প্রদেশগুলিতে রাজপ্রতিনিধিদের অত্যাচারী শাসন মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। বিন্দুসারের আমলে তক্ষশিলার জনগণ দুর্বিনীত রাজ-কর্মচারীদের (দুষ্ট মাত্য) বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁদের অভিযোগের পর অশোককে তক্ষশীলায় পাঠানো হয়। কিন্তু সম্রাট হওয়ার পর ঐ শহর থেকে একই অভিযোগ আসে। অশোকের কলিঙ্গ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে প্রদেশগুলিতে অত্যাচারী শাসন সম্পর্কে অশোক উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তাই তিনি মহামাত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন জনগণের সাথে দুর্ব্যবহার না করেন। এই উদ্দেশ্যে তোসলি, উজ্জয়িনী এবং তক্ষশীলায় রাজপ্রতিনিধিদের নিয়মিত বদল করা হত। অশোক নিজে 296 টি রাত্রি তীর্থস্থান দর্শনে অতিবাহিত করেছিলেন, শাসন ব্যবস্থার তদারকিতে এই যাত্রা বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল। কিন্তু এত করেও প্রদেশগুলিতে রাজকর্মচারীদের অত্যাচার বন্ধ করা যায়নি এবং অশোকের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই তক্ষশিলা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

Scanned with CamScanner

**প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে নতুন জ্ঞানের বিস্তার**

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি কয়েকটি বিশেষ সুবিধা কীভাবে মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্ভব করেছিল। মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে নতুন সংস্কৃতি মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্যে ও কলিঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যের মূল অংশ গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল তার বিশেষ গুরুত্ব হারায়। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে লৌহ নির্মিত সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রের ব্যবহার ও মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ছিল সমসাময়িক। মগধ থেকে আহৃত নতুন সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে নতুন রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। এইভাবেই মধ্যভারতে শুঙ্গ ও কান্ববংশ, কলিঙ্গে চেতী বংশ, এবং দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

**উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল উপেক্ষা**

অশোক প্রধানত ধর্মপ্রচারেই আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। তাই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার বিষয়ে তিনি মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর মধ্য এশীয় উপজাতিদের অগ্রসর হবার প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল। চৈনিক ও ভারতীয় সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ হানতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সাইথিয়ানরা। সাইথিয়ানরা ছিলেন যাযাবর শ্রেণীর। তাঁদের বাহন ছিল অশ্ব। সাইথিয়ানদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চৈনিক সম্রাট মি হুয়াং তি 220 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু অশোক অনুরূপ কোন ব্যবস্থা করেননি। স্বভাবতই সাইথিয়ানরা যখন ভারতাভিমুখে অগ্রসর হলেন তাঁরা পার্থিয়ান শক ও গ্রীকদেরও বাধ্য করলেন ভারতাভিমুখে অগ্রসর হতে। উত্তর আফগানিস্তানে গ্রীকেরা একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তখন এর নাম ছিল ব্যাকট্রিয়া। 206 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁরাই প্রথম ভারত আক্রমণ করেন। তারপর আসে একের পর এক আক্রমণ।

185 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ অবশেষে মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। শেষ মৌর্য নৃপতি বৃহদ্রথের তিনি সেনাপতি ছিলেন। পুষ্যমিত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ। জানা যায় যে তিনি প্রকাশ্যে বৃহদ্রথকে হত্যা করেন এবং সিংহাসন অধিকার করেন। শুঙ্গরা পাটলিপুত্র ও মধ্য ভারতে শাসন চালিয়ে ছিলেন। তাঁদের আমলে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রবর্তন

Scanned with CamScanner

হয়েছিল। জানা যায় যে বৌদ্ধদের প্রতি এই রাজারা দমনমূলক নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরী ছিলেন কাণ্বরাজারা। কাণ্বরাও ছিলেন ব্রাহ্মণ।

Scanned with CamScanner